ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 670-682
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.056

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস: বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের আত্ম-সংকট ও আত্ম-অন্বীক্ষা

শুভঙ্কর দাস, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the history of post-independence Bengali literature Narayan Gangopadhyay is widely known as a powerful novelist and short story writer. But while the notable novels of the first few phases of his literary career, such as 'Upanibesh', 'Shilalipi', 'Mahananda', 'Padasanchar', 'Amabasyar Gaan', have been studied and analyzed academically, his later self-investigative self-projective and confessional novels have not received as much intellectual scrutiny and critical acclamation. It is fair to say some have been neglected. However, in novels like 'Nirjan Shikhar', 'kacher Darja' the author has represented unmerciful as well as impartial analysis of the so-called intellectual and rational upper-middle class Bengali mind of a particular period which helps us to identify the layers of historical reality of our society and literature from an evolutionary point of view. Therefore, the present article attempts to provide a brief review and evaluation of such novels.

Key words: Narayan Gangopadhyay, Confessional novel, Bengali intellectuals, Analysis, Social reality, Historical significance.

উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালির ভাবজগতে সনাতন প্রাচ্য জীবনবোধের উপর নবজাগরণ-জাত পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও মননধর্মের তীব্র অভিঘাত সত্ত্বেও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল এক অখণ্ড মানবতার আদর্শ থেকে, পারিবারিক-সামাজিক শ্রেয়বোধ ও রোম্যান্টিক স্বাদেশিক চেতনার প্রত্যয় থেকে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে একের পর এক ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত গত শতকের প্রত্যয় বা স্থিতাদর্শে ভাঙন ধরিয়েছিল। ১৯০৫-১১ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। এক বৈপ্লবিক চেতনার ঐক্যসূত্রে যুবসমাজ বহ্নিমান হয়ে উঠলেও, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় 'স্বদেশী'র কিছু অবিমৃশ্য আলোড়ন এবং স্বাধীনতাকামী যুবমানসের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ নির্বাপিত হল। বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশী তরুণ সমাজে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধ সৃষ্টির সে-ই প্রথম পর্যায়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে স্বরাজলাভের আশায় ইংলণ্ডের তরফে মহাযুদ্ধের প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্ত্র-অর্থের রসদ জুগিয়েও প্রতিদানে পাওয়া গেল মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রবঞ্চনা। যুদ্ধের ফলে একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর

অভাব ও দুর্মূল্যতা জীবনযাত্রাকে দুর্বহ করে তুলছিল, অন্যদিকে উক্ত সংস্কারের বলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির অন্যপ্রদেশে চাকরি সংগ্রহের পথ হচ্ছিল ক্রমে সংকুচিত। এই সময় দমনমূলক রাওলাট আইন, প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগের নরহত্যাযজ্ঞ, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা (১৯২০) ও তার পরিণামী বিফলতা, ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের নিষ্ফল সমাপ্তি, সন্ত্রাসবাদী উন্মত্ততার পুনর্জাগরণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তালিকা দীর্ঘ না করে বলা চলে বিশ শতকের গোড়া থেকেই রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালির, বিশেষত যুবমানসে হতাশা, অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য ও প্রচল মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা ও আত্মঅনাস্থার সুরটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। এরই সমান্তরালে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বা তার অল্প আগে-পরে জীবনদর্শন, মূলগত বিশ্বাস ও রুচি এবং মানব-প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তিনজন বস্তুবাদী মনীষী-প্রবর্তিত তিনরকম তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে। কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদ বা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বা শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব-শোষক ও শোষিতের লড়াই অথবা বিপ্লবের পথে শ্রেণিহীন সর্বহারার সমাজপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব সাম্য, মানবমুক্তি, জনগণমুখিনতার স্লোগান শোনাল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সার্থকতা মানুষ-সভ্যতা-জীবন-জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত রূপান্তরের বিশ্ববোধকে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা দিল। চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) ক্রমবিবর্তনবাদে মানুষের পাশব সত্তার স্বীকৃতি, প্রাণীজগতের সর্বস্তরে অস্তিত্বরক্ষার ক্ষমাহীন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের ধারণা, বংশগতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে মানবচরিত্রের নির্মাণভাবনা মানুষের দেবত্ব সম্পর্কিত চূড়ান্ত মোহভঙ্গের কারণ হয়ে উঠল। অবশেষে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনোবিকলন তত্ত্বে মনের সচেতন সজ্ঞান ও অবচেতন নির্জ্ঞান এলাকার বাসিন্দা যথাক্রমে বাস্তব যুক্তিবুদ্ধি ও দুর্দমনীয় কামনা-বাসনার নিয়ত দ্বন্দ্ব, নিউরোসিস ও বিভিন্ন কম্পলেক্স বা গূঢ়ৈষা, অবাধ ভাবানুষঙ্গ, মানুষের নিজের ভিতরেই এরস ও থ্যানাটোস তথা রক্ষণ-সংযোগ-প্রেম-ধর্মী সত্তার সঙ্গে ধ্বংস-বিযুক্তি-হনন-ইচ্ছুক সত্তার টানাপোড়েন ভাববাদী দর্শনের প্রভাবকে নস্যাৎ করে দিল। মানুষের নিহিত অমৃতত্ব নিয়ে, মানুষের মর্মগত মহত্ত্ব নিয়ে, মানুষের মৌল দেবত্ব নিয়ে যে-সব সংস্কার বা বিশ্বাস এতকাল আমাদের মনে লালিত হয়ে আসছিল, এঁদের ঘোর বাস্তববাদী মানবতত্ত্ব সেই সব বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়ে বসল। বিশ শতকের তিরিশের দশকে কালগত ও মননগত অস্থিতাবস্থার জটিল বিন্যাসে জট-পাকানো বাস্তবজীবন তথা অন্তর্জীবনের দুষ্পাঠ্য গ্রন্থিমোচনের দায় ছিল ঔপন্যাসিকদের। সেই দায় স্বীকার করেন তিরিশের মননপ্রধান ঔপন্যাসিক- ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার এবং এঁদের সমান্তরালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসু।

জীবনানন্দ দাশ, মস্তিষ্কের গোপন প্রকোষ্ঠে 'বোধ'এর জন্ম-মৃত্যুতে আচ্ছন্ন যাঁর বিষাদকরোজ্জ্বল চেতনা, ত্রিশ দশকীয় মননশীলতার স্বাভাবিক কিরণসম্পাতে আত্মজীবনের নিরিখে প্রথম উপলব্ধি করছিলেন গ্রামীণ মধ্যবিত্তের অস্তিত্বগত দুর্দশাকে, অসহায়তাকে, বিপন্নতাকে। বিশেষত সেই মধ্যবিত্ত যখন সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর কবিচিত্তের অধিকারী, শিল্পসৃষ্টির অন্তর্লীন তাড়না যাকে সমাজের প্রচল অর্থে জীবনের চতুর্বর্গে সফল পুরুষ হতে দেয়নি, তখন সেই অন্তর্মুখী ব্যক্তিপাত্র চরম বিষাদখিন্ন সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই আত্মমোক্ষণের প্রয়াসী হয়েছে। এই সংকটের সত্যনিষ্ঠতা যেহেতু জীবনানন্দেরই আত্মজীবনের গভীরে প্রোথিত, সেহেতু তাঁর হাতেই বাংলা সাহিত্য প্রথম সার্থক স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস পেয়েছে – *'কারুবাসনা'* (১৯৩৩)। সমসময়ে বুদ্ধদেব বসুও তাঁর নাগরিক মননঋদ্ধ রোম্যান্টিক চেতনার আলোকে *'সানন্দা'* (১৯৩২), *'ধূসর গোধূলি'* (১৯৩৩), *'আমার বন্ধু'*

(১৯৩৩) ইত্যাদি আত্মকথনরীতির উপন্যাসে কিছু তীব্র আত্মসচেতন, অন্তর্মুখী চরিত্রের আমদানি করেছেন যারা আত্ম-উন্মোচনের তাগিদে কখনো কখনো স্বীকারোক্তির পথ অবলম্বন করেছে। কিন্তু যথার্থ স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস রচনার জন্য চরিত্রের পূর্বাপর যে তীক্ষ্ণধী যন্ত্রণাদায়ক চৈতন্যের নিরবচ্ছিন্ন অভিঘাত দরকার, যে দাহ, দংশনের প্রাবল্য দরকার তা এই উপন্যাসগুলিতে অনুপস্থিত। তিরিশের দশকে অপরাপর বাঙালি ঔপন্যাসিকের বুদ্ধিজীবী-মানসে চিন্তাকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ করে তোলার জন্য যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তার মূলে একদিকে যেমন আলোড়িত বিশ্ববীক্ষা, স্বদেশকে বিশ্বের অংশ হিসেবে উপলব্ধি, অপরদিকে তেমনি মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসার ভূমিকা ক্রিয়াশীল ছিল। কখনো ধূর্জটিপ্রসাদের চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে দেশজ ভাবপরিমণ্ডলের সাথে নবলব্ধ বিশ্ববীক্ষার সংযোগসাধনের ব্যক্তিক প্রয়াস, ভ্রান্তি, বিচ্যুতি; কখনো মানিকের উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় অবচেতন তত্ত্বের আলোকে লিবিডো-কাতর যন্ত্রণা ও উত্তরহীন নৈরাশ্যের ইতিকথা। তিরিশের বুদ্ধি-জগতে জীবনের সার্বিক-সংকটের স্বীকৃতি বেশ স্পষ্ট, সেই সংকটকে শিল্প-সৃষ্টিতে পরিহার না করার দৃঢ়তাও লক্ষণীয়। কিন্তু এই দৃঢ়তার মূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে প্রবল আশা। ভারতবর্ষে এই আশার চেহারা গড়ে উঠেছিল উপনিবেশের বন্ধনমুক্তির স্বপ্নে। বলা বাহুল্য, যত অস্পষ্টই হোক এই আশাবাদ, গণজীবনমুখী চেতনা-বিস্তার, বিস্তৃতি ও গভীরতায় বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের মৌল প্রেরণা বিষয়-নির্বাচনে ও শিল্প-প্রয়াসে যে সমগ্রসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, তা স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের উপযুক্ত সমাজ-মানসিক পটভূমি তখনও নির্মিত হতে দেয়নি। স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের যথার্থ বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী আশাহীন, প্রত্যয়হীন, মূল্যবোধলুপ্ত সার্বিক নেতিগ্রস্ত পরিবেশে খণ্ডিত চূর্ণ-বিচূর্ণ মানুষের আত্মস্বরূপ-সন্ধানের উদ্দেশ্যে চরম আত্মনাশা সচেতনতা ও সর্বার্থে অবক্ষয়িত অস্তিত্বের দহনজ্বালা অনুভবের তুরীয় বিপন্নতা পর্যন্ত।

প্রথম মহাযুদ্ধ যে গভীর আর্থিক সংকটের জন্ম দিয়েছিল, তা আরও ঘনীভূত হয় জমির উপর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নির্ভরতার ক্রমহ্রাসমানতায়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতা শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষা-পরিবহণ-প্রশাসনের কেন্দ্র হয়ে ওঠায়, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভোগা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত চাকরির আশায় শহরমুখী হতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে খাদ্য ও বস্ত্র-সংকট এই শহরমুখীনতার স্রোতকে করে প্রবলতর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে জাপানি আক্রমণ (১৯৪১), আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা (১৯৪২), মহাযুদ্ধের কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় কলকাতার অর্থনৈতিক ও সমাজজীবনে বৈনাশিক অস্থিরতা, কালোবাজারি-মজুতদারির সূত্রে সমাজে তীব্র আর্থিক বৈষম্য, দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্‌বাস্তু স্রোত – প্রায় দীর্ঘ এক দশকের ক্রমান্বয়ী আঘাত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বাঙালি কথাকারদের কিছুতেই অব্যবহিত পূর্ববর্তী দশকগুলির শান্তি-স্থিতি-প্রচলিত ধ্যানধারণার জগতে আস্থাশীল হতে দেয়নি। এই কালে যে তরুণ লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব, তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন ভাঙন ও বিপর্যয়ে সংক্ষুব্ধ দেশকালকে –

> "বাংলা এখন আপনাকে বাঁচাতে পারছে না। প্রাণ রাখতে গিয়ে আত্মা বিকিয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যত্ব ও টাকার দাম পড়ছিলো হু হু করে, পাল্লা দিয়ে সেই সঙ্গে যতেক মূল্যবোধ... ডিভ্যালুয়েশনের প্রথম পর্যায়। ধীরে ধীরে বিনষ্ট হচ্ছিলো ব্যক্তিগত শুচিতা, সম্ভ্রমবোধ, পরিবারগত সম্প্রীতি। অর্থনীতির আণবিক আঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ বলে যা কিছু সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিলো।

> জীবনকে যদি একটা সংগ্রাম বলি, তাহলে তার সমস্ত রণাঙ্গণ জুড়ে ঘটছিলো সুন্দরের পশ্চাদপসরণ ও প্রস্থান।"[১] (সন্তোষকুমার ঘোষ, *'এই বাংলা'*, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ-১৫৭-৫৮)

পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক জটগুলি অতিমাত্রায় প্রকট হতে লাগল। সতীত্ব-মাতৃত্ব-নারীত্ব-প্রেম-দাম্পত্য-বাৎসল্য-পরিবার প্রভৃতি যে সমস্ত স্নিগ্ধ পবিত্র সুকুমার বৃত্তিগুলিকে এতদিন জীবনে বড় মূল্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভাঙতে লাগল কলকাতার ফ্ল্যাটে, রাস্তায় বাস্তুহারা লাঞ্ছিত অসহায়তায়। স্বভাবতই এমতাবস্থায়, যখন সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য আসলে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্য ও সামাজিক স্থিরাদর্শহীনতারই ফল, যখন বিমুখ বর্তমান ও বিশূন্য ভবিষ্যৎ থেকে জন্ম হয় এক পঙ্গু নিরুপায়তাবোধের, ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব হয় না শরৎচন্দ্রের আবেগদ্রব অসম্পূর্ণ সমাজচেতনায়, কল্লোলের ইন্টেলেক্ট বিলাস বা রোম্যান্টিক বিপ্লববোধে, বিভূতিভূষণের সমাহিত বিশ্বরহস্যজিজ্ঞাসায় ফিরে যাওয়া। সামূহিক ও ব্যক্তিক মূল্যবিনষ্টি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও আগ্রহের অভাবের সামনে মানুষ তখন আত্মহত্যাকারীর নীরব নিরুপায় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরকম অবস্থায় সর্বাত্মক নেতির মধ্যে কোনো ইতিবাচক মানসদৃষ্টির সন্ধান জরুরি ছিল এবং সেজন্যই গোটা সমাজের দ্বান্দ্বিক চেহারার অনুধাবন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। মননশীল সমাজমানস তীক্ষ্ণধী সচেতনায় বুঝতে পারছিল, সমাজের সর্বৈব মূল্যহানি আসলে প্রতি একক ব্যক্তিমানুষের বিনষ্ট ন্যায়বোধের সমাহার। তাই সামাজিক ব্যাধিকে চিহ্নিত করতে হলে সবার আগে নিজের মুখোমুখি হয়ে আপন সত্তার গভীরে সেই ব্যাধি, বিকৃতি ও ক্লেদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সে স্বীকৃতির পথ সরল নয় - বহু বিকারে, মোহে, মিথ্যাচারে, ভড়ং-এ, আত্মছলনায়, বিভ্রমে তার পথ কন্টকাকীর্ণ। তবু এই আত্মব্যবচ্ছেদ ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিই তখন সামাজিক অবক্ষয় ও পচনশীলতা রোধের একমাত্র প্রতিষেধক। তাই নিজের কাছে, নিজের কালের কাছে, নিজের সামাজিক ও শিল্পিসত্তার কাছে সৎ, স্বচ্ছ, নির্ভীক থাকার দৃঢ় প্রত্যয় অঙ্গীকার করে স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস নির্মিত হতে থাকল দুঃসাহসিক আত্মবীক্ষণ তথা সমাজবীক্ষার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায়। জীবনানন্দের *'মাল্যবান'*, বুদ্ধদেবের *'গোলাপ কেন কালো'*, *'রাত ভরে বৃষ্টি'* ইত্যাদি ছাড়াও রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, গৌরকিশোর ঘোষ, সমরেশ বসু, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রতিভাধর ঔপন্যাসিকদের প্রাতিস্বিকতায় এই উপন্যাস-সংরূপ হয়ে উঠল বিচিত্রগামী।

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সূচিত যে ছিন্নমস্তা, নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যময় কাল, তার বৈনাশিক অন্ধকার দীর্ঘায়িত হয়েছিল এই শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। ফলত স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস সৃজনের ঐতিহাসিক দাবি ও ব্যক্তিগত তাগিদ ফুরিয়ে যায়নি শতাব্দীর উপান্তে পৌঁছেও। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছিলাম মানবতার চূড়ান্ত অবমাননার বিনিময়ে, রাশি রাশি উন্মূল জীবনের বিনিময়ে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নভঙ্গের বিনিময়ে, তা বাঙালির এক শতাব্দীর অর্জিত সমস্ত বিশ্বাস-শক্তির প্রত্যয়ভূমিতে গভীর ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। শরণার্থী জনগোষ্ঠীর বিরাট একটা ভাগ আর্থনীতিক স্বস্তি কখনো পেল না, আন্তরিক পুনর্বাসন তাদের কখনো ঘটেনি। মাটির শিকড় সম্মান যাদের লুণ্ঠিত তাদের মধ্যে মূল্যবোধ বিশেষ অবশিষ্ট থাকে না। এক প্রজন্মের অস্থিরতা উৎকেন্দ্রিকতা মূল্যহানি পরবর্তী প্রজন্ম-পরম্পরায় বাহিত হতে থাকে। উদ্‌বাস্তু সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নাসিকতা, শিল্পায়নের রুদ্ধগতি, ভয়াবহ বেকার সমস্যা, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার-হরণ, ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ, কমিউনিস্ট চীনের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি, তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের উপর অথবা ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর

কিংবা শান্তিপূর্ণ ছাত্রমিছিলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নকশাল আন্দোলন দমনে নৃশংস পুলিশি তৎপরতা বাঙালির রাজনৈতিক চেতনার জগতে বিশ্বাসরিক্ততার ও বিবিক্তির আততিকে ক্রমপ্রসারিত করে যাচ্ছিল। অন্যদিকে নাগরিক জীবনের মেট্রোপলিটন স্তরে সামাজিক জীবনের অখণ্ডতার ধারণার চূর্ণীকরণ, পারিবারিক নৈতিক শাসন ও সেন্টিমেন্টের পরাজয়, উগ্র বিভ্রান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ছোট পরিবারকেন্দ্রিক আত্মসুখপরায়ণ ফ্ল্যাট-কালচারে আত্মিকভাবে নির্বাসিত মানুষের অনিকেত বিচ্ছিন্নতাবোধ, শহরমুখী বৃত্তিহীন স্বার্থান্ধ জনপিণ্ডের মর্মসংযোগহীন সহাবস্থান, ভগ্নোদ্যম শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ক্রিয় ক্লীবত্বের মানসধর্ম সব মিলিয়ে সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও ঘুণধরা অসুস্থতার প্রকটিত রূপ। এইভাবে এক শতকের স্বৈরবৃত্ত কাল সামূহিক পাপ, সংশয়, বিচ্ছিন্নতা, অবসাদ, বিকার, গ্লানি, নিরর্থকতার ক্রোধ ও আত্মক্ষয়ী সচেতনতার পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে মানুষকে এক অসহ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করে। স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের ক্রমিক নির্মাণ এই অন্ধকূপ থেকে যন্ত্রণাশুদ্ধ উত্তরণের জন্য মানব-অস্তিত্বের যুগোপযোগী উন্মুখতাকেই প্রমাণ করে। যুগের এই অপরিহার্য দাবিপূরণের তাগিদেই সমকালীন অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিকের মত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্বে মহাযুদ্ধোত্তর শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের চারিত্র্য-ধর্মকে আনুবীক্ষণিক অন্তর্দৃষ্টির সামনে রেখে বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছিলেন। উপরন্তু মূলত মধ্যবিত্ত-লিখিত বাংলা উপন্যাসের পাঠকও ছিল উচ্চ ও মধ্য-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তাই মধ্যবিত্তের সংকট-স্বরূপ-নিরূপণ এই সময়ের ঔপন্যাসিকদের মনন ও সৃজন-চর্চার অন্যতম আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে উচ্চ-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অন্তর্গত মানুষ হিসাবে তাঁর উপন্যাসগুলিতে এই তথাকথিত প্রাগ্রসর শ্রেণির অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছিলেন আত্যন্তিক স্পষ্টতায় এবং এই শ্রেণির মানুষদেরই তাঁর অন্তিম পর্বের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসগুলির পাত্র-পাত্রী করে তুলেছিলেন।

স্থূল বিচারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক জীবনের চারটি পর্ববিভাগ লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্বের (১৯৪৩ -১৯৪৮) উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হলো - *'উপনিবেশ'*, *'মন্দ্রমুখর'*, *'স্বর্ণসীতা'*, *'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'*, *'সূর্যসারথী'*। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে (১৯৪৯-১৯৫৬) *'বিদিশা'*, *'শিলালিপি'*, *'লালমাটি'*, *'মহানন্দা'*, *'পদসঞ্চার'*। তৃতীয় পর্বের (১৯৫৭-১৯৬২) অন্তর্ভুক্ত হতে পারে *'অসিধারা'*, *'মেঘরাগ'*, *নিশিযাপন'*, *'ভস্মপুতুল'*। চতুর্থ পর্বে (১৯৬৬-১৯৭০) স্মরণীয় *'সন্ধ্যার সুর'*, *'পাতালকন্যা'*, *'নির্জন শিখর'*, *'তৃতীয় নয়ন'*, *'কাঁচের দরজা'*, *'আলোকপর্ণা'*। মূলত শেষ পর্বের কিছু উপন্যাসে আত্মানুসন্ধান ও স্বীকারোক্তিমূলকতা প্রাধান্য পেয়েছে। সেইসব উপন্যাসের বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন প্রিয় ঔপন্যাসিক মিখাইল শলোখভকে আদর্শ মেনে ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে, সেই তিনিই কীভাবে শেষ পর্বে অন্তর্মুখী ব্যক্তি-চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের ভাবপ্রেরণাগত নতুন বীক্ষায় এসে স্থিত হলেন, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা অপরিহার্য বলে বোধ হয়।

নিজের উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট এবং ঘোষিত জীবনাদর্শ সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন -

> "বাংলাদেশের আরো অনেক লেখকের মতোই আমিও কলম ধরেছিলাম পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রণার মধ্যে।... ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ।... সে দিনের বালক মনে তখন একটি মাত্র সংকল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যদি কলম

> ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য; যদি লিখতে হয় তবে তা স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেবার জন্য।"[২] ('শিল্পীর স্বাধীনতা', দেশ ২০ পৌষ ১৩৬৯, পৃ. ৮৯)

এই সজাগ দেশপ্রেমের আদর্শনিষ্ঠা আরও ঐকান্তিক হয়েছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা, বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন পথিক, শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় ও আস্থা পোষণে। তাই গান্ধীজির অহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়েও নিজে তরুণ বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু প্রেক্ষাপট হিসাবেই ব্যবহৃত হয়নি, চরিত্রের অন্তর্বিকাশে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লক্ষণীয় যে, তাঁর প্রথম দিকের অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কই বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক। আবার পরবর্তীকালে শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতোই এই নায়কেরা কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, যার পরিণতি মার্কসবাদে দীক্ষাগ্রহণ এবং নতুন সমাজগঠনের স্বপ্ন।

১৯৪২ সালে জলপাইগুড়িতে আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনাকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রগতি সাহিত্যান্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময়েই কলকাতায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, আর কয়েক মাস পরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা। এই সময়পর্বের *'তিমিরতীর্থ', 'মন্দ্রমুখর', 'শিলালিপি'* প্রভৃতি উপন্যাসে বিপ্লবী মার্কসীয় সাহিত্যাদর্শের প্রকাশ অনায়াসদৃষ্ট। তবে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী না হওয়ায় এবং দলকর্মীর মতান্ধতার বদলে শিল্পীর স্বাধীনচিত্ততা বজায় রাখায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্রম-বিকৃতি ও আদর্শ-বিচ্যুতির প্রবণতাকেও প্রত্যক্ষ করেন যন্ত্রণার্ত হৃদয়ে, যেমন *'শিলালিপি'*র রঞ্জন অনুধাবন করেছিল সশস্ত্র বৈপ্লবিকতার অন্তরালে বহমান যুগান্তর-অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি দলগুলির অন্তর্কলহ, বিদ্বেষ, বিরোধ, অনৈক্য, দলাদলির ভস্মরূপটিকে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ, চীন কর্তৃক ভারত-আক্রমণ, ১৯৬২ সালে নীতিগত স্বার্থে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি, শ্রমিক-সংহতির ভাঙন, কমিউনিজমের চৈনিক পররাজ্যলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হওয়া ক্রমশ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশ্বাসের ভূমিতে রিক্ত-নিঃস্ব করে তোলে। তাই *'তৃতীয় নয়ন'*-এর ভূপেশের জবানিতে আমরা লেখকেরই আক্ষেপোক্তি শুনতে পাই, "সতেরো বছরের বিশ্বাস যদি একদিন হঠাৎ দেউলে হয়ে যায়, তাহলে দাঁড়াবারও আর জায়গা থাকে না।" আমরা লক্ষ করি, ১৯৬৫ সালের *'অমাবস্যার গান'* উপন্যাসে *'উপনিবেশ'* বা *'পদসঞ্চার'* থেকে অনেকখানি সরে আসেন লেখক। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এখানেও নেই এমন নয়, তবে তা পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির ন্যায় রিপোর্টাজ আকারে বা এপিক বিস্তারে নয়, বরং অনেকখানি প্রক্ষিপ্ত ধরনে। রাজসভার বিদূষকে পরিণত ভারতচন্দ্রের চিত্রণে এক ধরনের নিয়তি-নির্দিষ্ট বা আগে থেকেই স্থিরীকৃত ব্যর্থতা ও পরাজয়ের চেতনা মনঃক্ষোভের সাথে প্রকাশিত হয়, যা *'নির্জন শিখর'*-এর অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যের সেই ডিটারমিনিজম্-এর পূর্বাভাষ। 'নিছক মতবাদের রুদ্ধ প্রাচীরে শিল্প-ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে' অসম্মত লেখকের জীবন-সায়াহ্ন-পর্বের উপন্যাসে তাই নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অন্তর্মুখিতা, আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস এবং ভাবপ্রেরণাগত এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই শিল্পরূপেরও পরিবর্তন ঘটে - দেখা দেয় আত্মোক্তিপ্রবাহ, মননপ্রবাহ, সাংকেতিকতা ও স্বীকারোক্তির প্রাধান্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের ধারায় প্রথমে আসে *'সন্ধ্যার সুর'* (১৯৬৬)। স্ত্রীকে হত্যা করে তিনদিনব্যাপী স্মৃতিচারণায় সংসারের প্রতি পদে প্রতারিত ও লাঞ্ছিত নায়কের স্বীকারোক্তি এই উপন্যাসের উপজীব্য। জবানবন্দীর সূচনায় নায়কের ভাব-সংকট ভাষারূপ পেয়েছে এইভাবে, "আমি কাউক খুন করতে চাইনি। বিশ্বাস করুন, আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করেন তো যে জীবনে কখনো কখনো খুন আর আত্মহত্যা এক হয়ে যায়- দুটোকে আলাদা করা যায় না।... বলতে পারেন কনফ্যেশন। তবে আপনাদের ঐ পুলিশের কাছে নয়, নিজের বিবেকের কাছে।"

চুয়াল্লিশ বছর বেঁচে থাকার পর জীবন যখন বারেবারে পড়া একটা পাঠ্য-বইয়ের মতোই মুখস্থ, বিবর্ণ, বৈচিত্র্যহীন হয়ে গেছে, যখন সে জেনে গেছে বাকি জীবন জুড়েও ভবিতব্যের হাতে মার খেয়ে যাওয়াই তার নিয়তি, তখন নিজে মরবার আগে তার চেয়েও নিরুপায়, অক্ষম ও ভাগ্য-পীড়িত স্ত্রী শীলাকে হত্যা করে তাকে জীবন-কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারার শেষ সান্ত্বনাটুকু পেতে চেয়েছে কথক। কিন্তু শীলা মরেনি, বরং সে জানিয়েছে যে, সে-ই নাকি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। খালাস পাওয়ার সংবাদে ভেঙে পড়েছে নায়ক। কারণ, সে জানে 'মৃত্যুর মুক্তি'র বদলে 'জীবনের নরকে' বাঁচতে বাধ্য হওয়া আত্ম-ধিক্কারে, পাপবোধে ও পরাজয়ের চেতনায় কী নিদারুণ গ্লানিময়, কী নিষ্করুণ টর‍্যাজিক! ব্যক্তির অসহায়তা ও পরাভব-বেদনা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে শিল্পরূপ পেলেও, অতিনাটকীয়তা উপন্যাসটির শিল্পধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তুলনায় *'নির্জন শিখর'* (১৯৬৮) উন্নততর সৃষ্টি। উনিশশো পঁয়ষট্টি খ্রিষ্টাব্দে পঁয়ষট্টি বছরে উপনীত দর্শনের অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্য অধ্যাপনা-জীবন থেকে অবসরপ্রাপ্তির শেষ দিনটিতে দাঁড়িয়ে আত্মবীক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, নিজের জবানীতেই উপন্যাসের কাহিনি আগাগোড়া পরিবেশন করেছেন, পর্যালোচনা করেছেন তাঁর জীবনের মুখ্য ঘটনা ও ব্যক্তিদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নির্মিত নিজেরই স্বরূপের।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের চরিত্রধর্মগত স্ববিরোধ এই যে, একদিকে তার নৈয়ায়িক আদর্শবাদী সামাজিক সত্তা বৃহত্তর কাল ও জীবনের সংঘর্ষমুখর ঘটনাপ্রবাহে যুক্ত হতে চায় রোম্যান্টিক আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায়, কিন্তু ভীরু আনুগত্যপরায়ণ ব্যক্তিসত্তা মধ্যবিত্ত চরিত্রের বাইরে যেতে পারে না, নিরাপদ স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গকে বেছে নিয়ে ভাববাদী দর্শনের মাঝে নিজের পলায়নপর মনোবৃত্তির নৈতিক সমর্থন খুঁজে চলে। অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে তাঁর ডিটারমিনিজম্ ও বার্গসঁর তত্ত্বলোক সেই নিরাপদ দুর্গ। প্রখ্যাত সমালোচকের প্রণিধানযোগ্য বক্তব্যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান-অনুকূল চিত্তবৃত্তির সংকীর্ণতা ধরা পড়েছে এইভাবে, "পরাধীনতার কালে তাঁদের অনেকেই—যাঁদের establishment-এর বুদ্ধিজীবী বলা যায়—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তোষণ করেছেন। ব্যক্তি এবং সম্পদের নিরাপত্তা ব্রিটিশ শাসনে অটুট থাকবে—এই interest-এর বশবর্তী হয়েই তাঁরা এই তোষণকর্ম চালিয়ে গেছেন। আবার অনেকেই—যদি এঁদের establishment-বিরোধী বলা যায়—ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে নিজেদের বৃত্তিগত সম্ভাবনা সংকুচিত দেখে বেদনাকাতর হয়েছিলেন। ভবিষ্যতের স্বপ্নে তাঁরাই আবার আবেগদীপ্ত হলেন: বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি ঘটলেই বোধহয় সমস্ত সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা যে আমাদের সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে কী ব্যাপক গভীর প্রভাব অনুস্যূত করে রেখেছে, তার কোনো যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন স্বাধীনতার পরেও বুদ্ধিজীবীরা করতে পারলেন না। ঔপনিবেশিক শাসনকালেই অবশ্য এই ব্যর্থতার জন্ম কারণ, বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার

পরিমণ্ডলেই 'মানুষ' হয়েছিলেন; ফলে ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে মৌলিক কোনো সমালোচনায় তাঁরা ব্যাপৃত হলেন না। তাছাড়া, এইসব বুদ্ধিজীবী তাঁদের মননচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের মর্যাদা বা স্বীকৃতির জন্য শাসককুলের অনুকূলে যে ভাবাদর্শ, তার চার দেওয়ালে বদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছেন। উদারনীতিবাদে আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রবর্তনা বোধ করলেও বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন 'intellectual satellites of the metropolitan intellectual world,' স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এই ব্যর্থতারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন।"[৩] এই বুদ্ধিজীবী-চরিত্র-বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলে যায় দেবনাথ ভট্টাচার্যের সলিলকিতে উঠে আসা নাগরিক আত্ম-কণ্ডূয়ন ও ব্যর্থতার গ্লানি, বৌদ্ধিক ও দার্শনিক ভাববিলাসের বাস্তবচেতনারহিত বিফলতার বয়ান, "না— কাউকেই আমি সুখী করতে পারলুম না। বাবাকে নয়, স্ত্রীকে নয়, নিজের সন্তানকেও নয়। আর নিজেকে তো নয়ই। আমার মতো মানুষেরা কাউকে সুখী করতে পারেও না। আমরা জোর করে দিতে পারি না, নিতেও পারি না। আমাদের মনের নৈয়ায়িক চিরকালের হ্যামলেটের মতো অনিশ্চয়তার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে টলমল করে—শেষ পর্যন্ত একটা নিরাপদ স্বার্থপরতার, একটা আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গকেই আমরা বেছে নিই।"

দারিদ্র্য ও নানা অঘটনে ম্যাট্রিকের আগে পড়া ছাড়তে হলেও প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বদান্যতায় প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করে, বহরমপুর কলেজে পড়তে গিয়ে, জ্যোতিপ্রকাশের গৃহে থাকাকালীন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী সিদ্ধার্থের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে দেবনাথ পুলিশি নজরে পড়ে আশ্রয় হারান। নিজের বাবাকে অশিক্ষা, অর্থলোলুপতার কারণে ঘৃণা করেন দেবনাথ, অথচ সিদ্ধার্থের কথায় যখন ইংরেজের চাটুকারিতার জন্য তার লয়্যালিস্ট বাবার প্রতি অশ্রদ্ধা স্পষ্ট ধরা পড়ে তখন দেবনাথ অসন্তুষ্ট হন নিজের মধ্যবিত্তসুলভ পিছুটানপ্রিয় ও সংস্কার-অভ্যস্ত 'অন্যতর শিক্ষায়' আঘাত লাগার দরুণ। ইতিমধ্যে দরিদ্র পিতা অর্থলোভে পড়ে ধনী পিতার দুলালীকে পুত্রবধূ নির্বাচন করে পুত্রের জোর করে বিবাহ দেন। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে এই বিয়ে যে আত্মহত্যারই নামান্তর, তা জানা সত্ত্বেও এবং মুক্তি পাওয়ার রাস্তা থাকা সত্ত্বেও দেবনাথ যে সেদিন চলে যেতে পারেননি, প্রৌঢ় দেবনাথ তার কারণ হিসাবে নিজের মধ্যবিত্ত ভীরুতাকেই চিহ্নিত করেন, স্বীকার করেন,

> "সেই মুক্তি আমার হাতেই ছিল, তবু তা আমি নিতে পারলুম না। যদি পারতুম তাহলে আমি সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় হতুম- দেবনাথ ভট্টাচার্য হতুম না। কিংবা এও সেই ডিটারমিনিজম্। সব নির্ধারিত হয়ে ছিলো আমার চরিত্রে, আমার ভাবনায়, আমার দুর্বলতায়, আমার ভীরুতায়।"[৪]

অবশ্য স্ত্রী মাধুরীর নীচ আচরণে বিয়ের পরপর বাড়ি ছাড়েন দেবনাথ, কলকাতায় পৌঁছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আনুকূল্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, নিজস্ব যোগ্যতায় কলকাতাতেই অধ্যাপনার সুযোগ পান। মাধুরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ও তাদের মধ্যবর্তী দেওয়াল পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। চাকরিজীবনের এক পর্যায়ে জ্যোতিপ্রকাশের মেয়ে বিদ্যুৎ দর্শন পড়ার জন্য তার ছোটোবেলার দেবুদার সঙ্গে দেখা করতে আসে। দুজনের মধ্যের গভীরতর অনুরাগ প্রেমে ঘনীভূত হয়ে বিয়ের পর্যায়ে পৌঁছালে বিদ্যুৎ সব জানিয়ে মাধুরীকে চিঠি লেখে নৈতিক সততা রক্ষার খাতিরে, বোন হিসাবে তার সব জানানো উচিৎ এই ভেবে। সব শুনে মাধুরী নিজের স্ত্রীর অধিকারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলে বিদ্যুৎ বিদায় নেয়। পূর্বের শঠ, মিথ্যেবাদী, বিষাক্ত মনের মাধুরী তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত; তবে বর্তমানের লক্ষ্মীমন্ত, পরোপকারী, সহৃদয়া মাধুরীর প্রতিও তো দেবনাথ কোনো আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন না। প্রথম যে নারীর সান্নিধ্য দেবনাথকে তার

প্রেমিক সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, দিয়েছে জীবনের অর্থ ও বাঁচার উষ্ণ আশ্লেষ, সেই বিদ্যুৎকে হারিয়ে শূন্যতার অতলে তলিয়ে যেতে যেতে আরও একবার দেবনাথ ভাবলেন, এই পরিণামই তার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল- একে বদলানোর মত দৃপ্ত পৌরুষ বা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তার নেই। অবশ্য পঁয়ষট্টি বছরের দেবনাথ অন্তত বর্তমানে নিজস্ব চিন্তনে বিদ্যুৎকে অন্তরতমার মর্যাদা দান করে অকপটে স্বীকার করতে পেরেছেন, "আজ পঁয়ষট্টি বছরে নিজের কাছে আমি কোনো আবরণ রাখবো না। আমি বিদ্যুৎকে ভুলতে পারলুম না। নারী হিসাবে আমার জীবনে সে-ই বিদ্যুতের মত এসেছে আর মিলিয়ে গেছে। মাধুরী শুধু স্ত্রী হিসাবেই এসেছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত এতটুকু আকাশ, এতটুকু জ্যোতির্ময় বিস্তার তার মধ্যে ছিল না।"[৫] মাধুরী-দেবনাথের ছেলে বারীন শৈশব অবস্থা থেকেই মায়ের প্রতি বাবার শীতল ঔদাসীন্যকে বুঝে নেয়, যেন একপ্রকার মায়ের জয়ের জন্যই বাবার জীবনাচরণ, আদর্শ, মত ও পথের বিরোধিতায় দর্শনের বদলে অর্থনীতি নিয়ে পড়ে, সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতি করে, শিপ্রাকে ভালোবেসে বাড়িতে নিয়ে এসে অবাধে মেলামেশা করে। অবশ্য এই মতান্তর ও প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিকতার মধ্যে দেবনাথ নিজেরই পূর্বনির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত সত্তার মুক্তপক্ষ বিস্তার ও পরিপূরকতা দেখতে পেয়ে তৃপ্ত হোন। যে মধ্যবিত্তসুলভ পিছুটান ও নিরাপত্তাবোধের কারণে তিনি সত্যাগ্রহে বা বিয়াল্লিশের রক্তঝরা পথে নামতে পারেন না অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে, সেই অনিশ্চয়তাকে জয় করে বারীন নিজ চরিত্রবলে রাজনীতি করে, দৃপ্ত ভাষণ দেয় সভা-সমিতিতে, প্রয়োজনে পুলিশের হাতে প্রহৃত হতেও পিছপা হয় না। দর্শনের ভাববিলাসের নির্জন শিখরে বসে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পলায়নপরতার ছদ্মবেশ বলে চিনতে পারেন দেবনাথ, চিনতে পেরে বৃহত্তর জীবন-সমুদ্রে বারীনের কর্মময় অংশগ্রহণের মধ্যে নিজের ভীরু মধ্যবিত্ত 'আমি'-র প্রতিফলন না দেখে পরম আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু সেই বারীনও একটা সময়ে দেশ-দশের কথা ভুলে আত্মসুখের স্বার্থে যখন রাজনীতি ত্যাগ করে এল.আই.সি অফিসারের চাকরি 'ম্যানেজ' করে নিল, দেবনাথ বুঝলেন যে, তার-ই ভীরু, কাপুরুষ, নিরাপত্তা প্রিয় সত্তা তার ছেলের মধ্যে বংশগতির উত্তরাধিকার স্বরূপ কী ভয়ঙ্কর বিষবৃক্ষের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে! বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের এই নৈতিক ও আত্মিক সংকট অকপট, নির্মম স্বীকারোক্তির আকারে ধরা পড়েছে দেবনাথের জবানীতে –

> "ভেবেছিলুম - যা আমি পারবো না, তা আমার ছেলে পারবে; তার জন্মগত প্রতিযোগিতায় সে আমাকে ছাড়িয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। কিন্তু পারলো না। আমার জন্মবীজের অভিশাপ নিয়ে আমারই বিকৃত বিকলাঙ্গ সত্তা হয়ে, আমাকেই বিদ্রূপ করে গেল। তার মধ্য দিয়ে আমি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলুম।"[৬]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে দেবনাথ ভট্টাচার্যের মতোই ভালো ছাত্র ছিলেন, এম-এতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন, এক বছর পড়াশোনা করতে পারেননি, রেণু ও আশা - দুই স্ত্রীয়ের মধ্যে বিভাজিত হয়ে দ্বন্দ্বজর্জরতা তাঁরও ছিল, আর রাজনৈতিক চেতনার জগতে এক বিশ্বাসের ভাঙন থেকে আরেক বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তাঁর ক্লান্ত দেউলে হয়ে যাওয়ার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, দেবনাথের সংকট অনেকখানিই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্ব সংকটের প্রক্ষেপণ, এ কথা স্বীকার্য। সে অর্থে, *'নির্জন শিখর'* সীমিতার্থে আত্মজীবনীমূলক স্বীকারোক্তি-উপন্যাসও বটে।

'তৃতীয় নয়ন' (১৯৬৯) উপন্যাসে ইন্দিরা, ধীরাজ সেন, ভূপেশ দস্তিদার তিনটি প্রধান চরিত্র। তিনজনের আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে একের অন্য দু'জন সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কেও কিছুটা স্বগতোক্তিতে, কিছুটা

সংলাপে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ফুটে উঠেছে মাত্র। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায় নেই বললেই চলে। আত্মনিরীক্ষায় শামিল হয়ে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী আবেগ-যুক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের আয়নায় সমস্ত অস্বচ্ছতা কাটিয়ে নিজের অকৃত্রিম স্বরূপটিকে আবিষ্কার ও স্বীকার করার যে জটিল বহুরৈখিক কৌশল স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে দেখা যায়, তা এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে ইন্দিরা তরুণী বয়সে রহস্য, দুর্বোধ্যতার প্রতি আকর্ষণবশত বিপ্লবী মার্কসবাদী ভূপেশের কার্যকলাপ ও বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে একধরনের রোম্যান্টিক প্রণয় অনুভব করে। অবশ্য ভূপেশের ডাকে ঘর ছেড়ে বিপ্লবের পথে পা বাড়ানোর মত না ছিল তার কঠোর আদর্শ, না প্রেমের আত্মঘাতী গভীরতা। অন্যদিকে, ভূপেশ সাঁওতালদের সংগঠিত করে বিদ্রোহের আয়োজন করলে পুলিশি ধরপাকড় থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় পূর্ববঙ্গে, ধরা পড়ে কারাগারে দীর্ঘ কয়েকবছর শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হয়, অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্যে গ্যাস্ট্রিক আলসার আর টিউবারকুলোসিস নিয়ে ফিরে আসে পশ্চিমবঙ্গে। ততদিনে শুধু তার দৈহিক ক্ষয়ই ঘটেনি, ঘটেছে মানসিক মৃত্যুও। কমিউনিস্ট চিনের ভারত-আক্রমণ, পররাজ্যলোলুপতার হিংস্র চেহারা, নীতিগত দ্বন্দ্বে ভারতের মার্কসবাদী পার্টির ভাগ হয়ে যাওয়া ও দলাদলি ভূপেশের সমাজতন্ত্রবাদী বিশ্বাসকে আমূল আঘাত করে তার এতদিনের সংগ্রাম, আদর্শ ও অস্তিত্বকে করেছে অর্থহীনতায় পর্যবসিত। সরকারি চাকুরের মেয়ে ইন্দিরার স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে হয়েছে সরকারি জজ ধীরাজের সাথ, যার মধ্যে 'নির্জন শিখর'-এর অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যেরই ছায়াপাত লক্ষ করা যায় অনায়াসে। ধীরাজ দেবনাথের মতোই ডিটারমিনিজম তত্ত্বের আলোকে জীবনকে দেখে—সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত, নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। তার বিশ্বাস "নাটক কেউ লিখে রেখেছে—তুমি এক জন্মতাড়িত অভিনেতা, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে— ঘটনা থেকে ঘটনায় তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে, একটা সিচুয়েশন বদলাতে পারো না তুমি— একটা ডায়লগ পর্যন্ত না।" আর এই সর্বাত্মক অক্ষমতার জন্যই তার মত মানুষের কাজ শুধু 'ভূশণ্ডীর কাকের' মত দেখে যাওয়া, বুদ্ধি সজাগ রেখে নিরাসক্ত দার্শনিকের ন্যায় বিশ্লেষণ করে যাওয়া।

এই তিন নর-নারীর দৈব-সংযোগে পুনরায় সাক্ষাৎ এবং একত্রে আবহাওয়া-পরিবর্তনের জন্য এসে একদিনের কালগত পটভূমিকায় আত্মচারণার মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু সত্যের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইন্দিরা বুঝেছে, ধীরাজকে সে উপযুক্ত বৌদ্ধিক সাহচর্য দান করতে পারে না। নিজের সেই অপারগতার জন্য ধীরাজের দেওয়া আর্থিক নিরাপত্তা, জাগতিক সুখ ও ঐশ্বর্যকে সম্মান জানাতেই সে নিজের প্রকৃতিপ্রেমী, রোমান্টিক আমি-র মৃত্যু সহ্য করেও শুধুমাত্র স্ত্রীর কর্তব্য পালনের জন্য বেঁচে থাকবে। এই দাম্পত্য যে প্রেমহীন, শুধুই অভ্যাসের ক্রমিক অনুশীলন মাত্র, সে সত্য তার স্বগত-উক্তিতে ধরা পড়েছে,

> "বাড়ির ছাদে যে টবের গাছগুলোতে তিনি কখনো কখনো বিকেলে নিজের হাতে জল দেন, অথচ দুটি বেলের কুঁড়ি, একগুচ্ছ জুঁই অথবা একটা লিলির ডাঁটি উঠলে চেয়েও দেখেন না, তাঁর জীবনে আমার জায়গা ঠিক ওই রকম। আমাকে উনি বাঁচিয়ে রাখতে ভালোবাসেন, কিম্বা বাঁচিয়ে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, তাই আমি ওঁকে খুশি রাখবার জন্যই অনেক দিন বেঁচে থাকব।"[৭]

ধীরাজের কাছে জীবন একটা থিয়োরি, মানুষ একটা ইম্প্রেশন, কতকগুলো বুদ্ধি-যুক্তি-বিন্যাসের সমষ্টিমাত্র। তাই ইন্দিরার রক্ত-মাংসের ব্যক্তিসত্তাকে সে গুরুত্ব দেয়নি, তার আবেগ-অনুভুতি-ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বতন্ত্র জগতকে স্বীকার করেনি। বরং নিজের ফাঁপা দার্শনিকতার ছাঁচে স্ত্রীকে গড়তে গিয়ে ইন্দিরার আদি-অকৃত্রিম নারীসত্তাকে হত্যা করেছে। সুখ-অসুখ, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদির উর্ধ্বে নিজের অবস্থানের

ভ্রান্তিকে আঁকড়ে থেকে ইন্দিরার মানসিক আশ্রয়হীনতার অসুখকে বহুগুণিত করে গেছে মাত্র। এই সত্য ধীরাজের অবগত, না হলে সে নিজের পরিপাটি বসার ঘরের অভ্যন্তরস্থ বেসুর বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করতে পারত না, "তবু জীবনে অ্যাকর্ড তৈরি করা অসম্ভব নয়। কম্প্রোমাইজও করা যায় খানিকটা। আমি অস্বীকার করবো না—ইরার সঙ্গে আমার তাও হয়নি। দু-নদীর জল পাশাপাশিই বয়ে গেল। অথচ, সাদা চোখে আমার সংসারের দিকে তাকাও। নির্ঝঞ্ঝাট সুখী সংসার। মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাবী ড্রাজারি নেই, দাম্পত্যকলহ নেই, মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য আছে এবং—এবং—অ্যানাদার ভ্যানিটি—সামাজিক মর্যাদাও কিছু আছে।"[৮] অবশ্য এই স্বীকারোক্তির মধ্যে কোথাও ধীরাজের আত্মদহন বা অপরাধবোধের তীব্রতা অনুভূত হয় না।

ব্যক্তিগত জীবন ও বৃহত্তর জীবনে পরাজিত, নিঃশেষিত, ভগ্নমনোরথ ভূপেশের সংকট আসলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক চেতনা তথা সাহিত্যাদর্শে ক্রমশ আস্থা হারানো ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই নিজস্ব সংকট। সে অল্প বয়সে ইন্দুকে ভালোবেসে পায়নি, নিরুকে নিজের বিপ্লবী মতাদর্শের যোগ্য সঙ্গিনী হিসাবে পেয়েও হারিয়েছে, সর্বোপরি কমিউনিজমের সর্বহারার একনায়কতন্ত্র ও শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার ইউটোপীয় চেতনার প্রত্যয়ভূমি হারিয়ে সে আজ ভবিষ্যতহীন, বর্তমানহীন নিজের অতীতের ভস্মাবশেষ মাত্র, এ সত্য সে স্বীকার করে নিয়েছে। ধীরাজ-ইন্দিরার দাম্পত্য-সম্পর্কে তার ও ইন্দিরার বাল্যপ্রণয়-সম্পর্কের কোনো কুপ্রভাব-বিস্তারকারী ছায়াপাত ঘটেছে কিনা, সে সম্পর্কিত ক্ষণিকের আলোড়ন ব্যতীত এই চরিত্রটিও সরলরৈখিক। এক চূড়ান্ত নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে ভূপেশের মৃত্যুও যেন জোর করে আরোপিত মনে হয় ; যেন সে মৃত্যুর আয়োজন ধীরাজের অকস্মাৎ নবজাগরিত চেতনার স্বীকৃতি আদায়ের জন্যই, "ইরা, তুমি তিলে তিলে মৃত্যুর কথা ভেবেছ। আমি জীবন-মৃত্যুকে এক করে নিয়ে এক নকল নিরাসক্তির নির্বোধ নায়ক ছিলুম। আজ এই মৃত্যুটা প্রমাণ করলো বেঁচে থাকার ঐশ্বর্য কত বেশি, নিরাসক্তিটা কী নিরর্থক প্রলাপ।"[৯]

ধীরাজের সদর্থক এই জীবন-প্রত্যয়ে পৌঁছানোর রাস্তা আত্মান্বেষণ, অপরাধবোধ, ভ্রান্তি ও সত্যের মুহুর্মুহু টানাপোড়েন, স্বীকারোক্তি ও যন্ত্রণাশুদ্ধ উত্তরণের দীর্ঘ মানস-প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল না। তাই ধীরাজ যখন নতুন করে বাঁচার কথা বলে, তখন সন্দেহ থেকেই যায় যে, এও তার তত্ত্বপিপাসু মনের কোনো কৃত্রিম ভাবাতিরেক কিনা। সে সংশয় তার নিজেরও মন থেকে যায়নি। তাই তো, ভূপেশের মহান মৃত্যুতে জীবনের দাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর নতুন করে স্ত্রীকে নিয়ে বাঁচার পরিকল্পনার পরমুহূর্তেই কিছুক্ষণ থেমে সেই পরিকল্পনার সাফল্য বিষয়ে সন্দিহান হয়ে তাকে বলতে হয়, "কী জানি।" ইরার উত্তরহীনতা আর ধীরাজের এই অনিশ্চিত সংশয় স্বীকারোক্তির শিল্পমূল্যকে খর্ব করে, উপন্যাসটিরও।

'কাচের দরজা' উপন্যাস যথার্থ স্বীকারোক্তিমূলক। তবে এর শিল্পাঙ্গিকে নতুনত্ব আছে। সাংকেতিকতায় সমৃদ্ধ, গতিতে খরধার, ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ উপন্যাসটির গঠনকৌশলে নাট্যধর্মিতার লক্ষণ পরিস্ফুট। শুধু নাট্যলক্ষণ নয়, কাহিনিগত সংহতি, সংলাপের গুরুত্ব, ঘটনার গতি ও চমৎকারিত্ব নাট্যোপন্যাস নির্মাণের অভিপ্রায়কে স্বীকৃতি দেয়। এখানে চরিত্রের আত্ম-নিরীক্ষা, উন্মোচন, স্বীকারোক্তি অন্যনিরপেক্ষে অনবচ্ছিন্ন নির্জনতার মধ্যে ইনটেরিয়র মনোলগের মাধ্যমে নয়; বরং একে অন্যের মুখোমুখি বসে, সংলাপ-প্রতিসংলাপ-আশ্রয়ে এবং নাটকসুলভ আরোহণ-ক্লাইম্যাক্স-অবরোহণ পদ্ধতির বিন্যাসে।

বিদেশ থেকে সদ্যফেরত প্রবালের সাথে দেখা করতে আসে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিত্যানন্দ সোম। প্রবালের স্ত্রী সীমা পিকনিকে গেছে বলে দুজনেই জানে। নগরজীবনের প্রাণহীন যান্ত্রিকতা, পুরনো মূল্যবোধগুলির

বিনষ্টি, পূর্ববঙ্গের মায়াময় প্রকৃতি ও অতীত জীবনের প্রতি নস্টালজিয়া ইত্যাদি নিয়ে কথোপকথনের এক পর্যায়ে প্রবাল খুঁজে পায় সীমার রেখে যাওয়া চিঠি। সে চিঠিতে আত্মিক বিচ্ছিন্নতার দেওয়াল-ওঠা দাম্পত্য ও নিষ্প্রাণ জীবনের অসহ্য বন্ধন পরিহার করে সীমার চিরকালের মত চলে যাওয়ার কথা ছিল লিখিত। সীমার এই বিদায়-গ্রহণ প্রথমে সোমকে ও পরে প্রবালকে বিবেক-তাড়িত করে, তারা নিজেদের মুখোমুখি বসে নিজেদের ভূমিকার পর্যালোচনা করতে তৎপর হয়, 'সীমার চলে যাওয়ার আয়নায়' নিজেদের মুখ-মুখোশ-মুখশ্রী উন্মোচনের উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তির পথ অবলম্বন করে।

অবিবাহিত সোম স্বীকার করে, কীভাবে বাল্যবন্ধু প্রবালের বিশ্বাস ও নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে সীমাকে 'সিডিউস' করে তার সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক সে তৈরি করেছিল। তবে এই পর্যায়ে সোম-সীমার কথোপকথনের মাধ্যমে এ সত্যও অস্পষ্ট থাকে না যে, সীমার মধ্যেও শূন্যতা ছিলো, স্বামীর কাছে আর্থিক নিরাপত্তা-বস্তুগত ঐশ্বর্যবিলাসের সমস্ত উপকরণ পেলেও হৃদয়-সংযোগের আন্তরিক আশ্লেষ সে পায়নি, তাই সোমের স্তুতিবাদে বিভ্রান্ত হয়ে রামধনু-রাঙা আকাশের খোঁজে সোমকে সে প্রশ্রয় দিয়েছিল। অন্যদিকে, প্রবাল স্বীকার করেছে রত্না চৌধুরীর সাথে তার পরকীয়া সম্পর্কের কথা, সীমাকে সম্পূর্ণ ভালোবাসতে না পারার কথা। সীমার অর্থ ও বস্তুরতিময় জীবনদৃষ্টিই হয়তো প্রবালকে ঠেলে দিয়েছে অপ্রেম-পীড়িত রত্নার দিকে। রত্না আমেরিকায় গিয়ে গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা গেছে। শেষে সীমার ফোন এলে যখন সোম ও প্রবাল জানতে পারে যে, সীমা পিকনিকেই গেছে, তার চিঠিটা আসলে বহুদিন আগের কোনো এক অভিমানহত মুহূর্তের রচনা, আজকের নয়, ততক্ষণে ঘষা কাচের অস্বচ্ছ দরজাটা তাদের সামনে থেকে সরে গেছে। নিজেদের অকপট আত্মপরিচয়লাভে অনৃতভাষণের আর কোনো জায়গা তখন নেই। অবশ্য সীমার ফোন ও ফেরার খবরে পূর্বেকার সমস্ত স্বীকারোক্তি সোমের কাছে হয়ে উঠেছে অসহ্যকর প্রহসন। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নিজ স্বরূপের যে নগ্নতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, তারপরে তার পক্ষে আর সম্ভব নয় প্রবাল বা সীমার বন্ধু হয়ে থাকা। তাই সে পালিয়েছে। আর প্রবাল মানস-সংকটের বিপজ্জনক কিনারায় পৌঁছে সুস্থ জীবনবোধে ফেরার আকুলতা জানিয়েছে তার মামা অসীম রায়ের কাছে, "আমাদের যেতেই হবে মামা। জীবনের একটা মানে কোথাও আমাদের পাওয়া দরকার।"[১০]

উপন্যাসের উপসংহারের অনেক আগেই প্রবাল বর্তমান সমাজে প্রতিটা মানুষের নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত অন্যকে ফাঁকি দিয়ে ও ফাঁকি পেয়ে বেঁচে থাকার, একে অন্যকে মানবিক অনুভববেদ্যতায় ছুঁতে ও বুঝতে না পারার ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ও শুভবোধের আততিকে স্বীকারোক্তির আকারে ব্যক্ত করেছিল, "সোম, যে-জীবনের মধ্যে তুমি আমি আমরা বেঁচে আছি, সেখানে কোনো সততা নেই, কোনো বিশ্বস্ততাও নেই। সে-সব মূল্যবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি, যা জীবনের গভীরতম শেকড়কে আঁকড়ে আছে,...। আমাদের কোনো আদর্শ নেই বলে কেউ সৎ হতে পারি না, বিশ্বস্ত হতে পারি না। পরস্পরকে অনেকখানি ফাঁকি দিয়ে আমরা কম্প্রোমাইজ করে নিই—একভাবে চলতে থাকে, ফাঁকিটা বাড়তে বাড়তে একদিন হঠাৎ ভেঙে পড়ে সব।"[১১] আসলে এই নির্মম সত্য শুধু সোম বা প্রবালের ব্যক্তিগত উচ্চারণ নয়, বরং আত্মসর্বস্ব পুঁজিলোভী স্বার্থপর বিবিক্ত প্রতিটি নাগরিক মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেকী সত্তার সম্মিলিত স্বীকারোক্তি।

উপরে আলোচ্য উপন্যাসগুলির দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব, এগুলিতে যে চরিত্রদের অবলম্বন করে মূলত কনফ্যেশন গড়ে উঠেছে তারা সকলেই সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত। যেমন, *'নির্জন শিখর'*-এর দেবনাথ ভট্টাচার্য দর্শনের অধ্যাপক, *'তৃতীয় নয়ন'* উপন্যাসের ধীরাজ সেন কোর্টের জজ এবং

দার্শনিকচিত্ত, *'কাচের দরজা'* উপন্যাসের প্রবাল স্ট্যাটিস্টিশিয়ান ও সোম পেশাদার ফটোগ্রাফার। এরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও জীবনতাত্ত্বিক গোত্রের। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমকালে রমাপদ চৌধুরী যখন তাঁর *'খারিজ', 'লজ্জা'* প্রভৃতি স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে ছাপোষা মধ্যবিত্তের শ্রেণিস্বার্থ-চেতনা, সমাজভীতি, ভণ্ডামিকে তুলে ধরেন, দিব্যেন্দু পালিত *'আমরা'* উপন্যাসে যেখানে নিম্ন-মধ্যবিত্তের অসম আর্থিক সংগ্রাম ও চরম অনির্দেশ্যতার মাঝে তার অননুভূত অস্তিত্বের স্থবিরতাকে ভাষারূপ দেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে তাঁর স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর কালে তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়ালদের নাগরিক আত্মকেন্দ্রিকতা, জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা ও শিথিল বিরোধপূর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতা-জনিত আত্মিক সংকটকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন।

তথ্যসূত্র:

১) ঘোষ, সন্তোষকুমার, *'এই বাংলা'*, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ. ১৫৭-৫৮।
২) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, শিল্পীর স্বাধীনতা', দেশ, ২০ পৌষ ১৩৬৯, পৃ. ৮৯।
৩) নাগ, শ্রীরঞ্জু, 'বুদ্ধিজীবীদের কাল শেষ হল', 'কম্পাস', ৩ এপ্রিল ১৯৭১ সংখ্যা।
৪) নির্জন শিখর, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী' দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, তৃতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ১৬৩।
৫) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।
৬) প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।
৭) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'তৃতীয় নয়ন', 'সেরা পাঁচটি উপন্যাস', মিত্র ও ঘোষ, কার্তিক ১৪২১, পৃ. ২০৮।
৮) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।
৯) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।
১০) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'কাচের দরজা', 'সেরা পাঁচটি উপন্যাস', মিত্র ও ঘোষ, কার্তিক ১৪২১, পৃ. ৩৩৭।
১১) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।